শান্তিনিকেতনে হৈ হৈ সঙঘ

সুভাষ চৌধুরী

'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থে ব্যঙ্গনাট্যগুলি যখন প্রথম পারিবারিক 'বালক' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন রবীন্দ্রনাথ এগুলির মুখবন্ধ স্বপ একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) তিনি লেখেন "বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ মাত্রকেই অ ামরা ছেলেমানুষি জ্ঞান করি-- বিজলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অ ামরা বুঝি না যে যাহারা কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন এই মন্তব্য করেন তখন তাঁর বয়স চবিবশ বছর। হাস্যকর সম্পর্কে নিজস্ব যে ভাবনা ছিল যেমন তাঁর বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র হাস্যরস প্রসঙ্গেও প্রবন্ধ রচনা করেন; 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের "কৌতুকহাস্য" ও "কৌতুকহাস্যের মাত্রা" তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রসঙ্গত 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত "বঙ্কিমচন্দ্র" ও "আষাঢ়ে" প্রবন্ধদুটি এবং 'সাধনা' মাসিকপত্রে (ফাল্গুন ১২৯৯) প্রকাশিত 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে তিনি লিখেছেন "আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেম ানুষি মনে করি, সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য, তাহা সকলেই অবগত অ াছেন। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, খেলারও তেমন সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানেও সকল প্রকার পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধূলা আমোদপ্রমোদ কৌতুক পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তণতা।"

আবার অগ্রহায়ণ ১৩০৫-এ লিখলেন "আমরা বাঙালি পাঠকেরা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বেরসিক বর যেমন ব াসরঘরের অপ্রত্যাশিত রসিকতায় খাপা হইয়া উঠে আমরাও ছাপার বই খুলিয়া হঠাৎ আদ্যোপান্ত কৌতুক দেখিতে প াইলে ছিব্‌লামি সহ্য করিতে পারি না।"

"কৌতুকহাস্যের মাত্রা"য় তিনি লিখেছেন "যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই। হঠাৎ না হইলে কিম্বা আর এক প হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।"

হাস্যরসসৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কয়েকটি মাত্র অভিমত এখানে উল্লিখিত হল। অন্যদিকে চিহীন ব্যঙ্গ অনুকৃতি তিনি কতখানি অপছন্দ করতেন সে কথাটিও জানার প্রয়োজন। টেনিসনের 'ডি প্রোফন্ডিস' কবিতাকে বিদ্রুপ করে Punchপ্রত্রিক া 'De Rotundis'নামে একটি কবিতা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন "আমরা এপ বিদ্রুপ কোনোমতেই অনুমোদন করি না।... আমাদের জাতীয় ভাব এপ নহে। যদি বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার সভামধ্যে কেহ তাহার হৃদয়নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচচারণ করিয়া মুখভঙ্গি করিতে থাকে, তবে দেখিয়া রসিক পুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে তাহাদের ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে হাস্যরসসৃষ্টি সম্পর্কে যে সংযম এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন তা তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিকসৃষ্টিতে মেনে চলেছেন--- কখনো সামান্য বিচ্যুতি ঘটবার অবকাশ দেন নি। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গান, চিঠিপত্র-- সর্বত্রই তাঁর ব্যঙ্গ-কটাক্ষের পরিশীলিত পের নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত বলা যায় 'জীবনের নানা অসংগতি ও অযৌক্তিকতাই হ াস্যরসসৃষ্টির মূল উপাদান' --- এর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন বার বার তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে। আর মেনেছেন 'প্রকৃষ্ট হ াস্যরসিক ক্ষমাশীল স্নিগ্ধ সহানুভূতির দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেন এবং প্রসন্ন হাসি দিয়ে আমাদের দুর্বলতাগুলিকে মেনে

নেন। এই সদাপ্রসন্ন সহৃদয়তা ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকৃষ্ট হাস্যরসের উৎস।'

অমিতাভ চৌধুরি লিখেছেন "শান্তিনিকেতনে.... রসিকতার চর্চা বরাবর। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দশ বছর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার আগে পর্যন্ত আশ্রমিকের মাপকাঠি ছিল রসিকতা বোঝে কিনা। এই ব্যাপারে অতুলনীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ক্ষিতিমোহন সেন এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'গান' ছিল ভুবন (ডাঙা) বিখ্যাত। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয়ে নানারকম রসিকতা তাঁর গান বা কবিতার মত সারা আশ্রমে ছড়িয়ে ছিল। এই রবীন্দ্রনাথেরই উদ্যোগে ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় 'বাঙাল সভা'। সভপতিত্ব করেন সুকুমার রায়। শান্তিনিকেতনে তাঁর যাতায়াত ছিল প্রায়ই প্রতিমাসেই। প্যারডি রচনায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। শান্তিনিকেতনের রান্ন াঘরে অনবরত আলুর তরকারি খেয়ে খেয়ে বীতশ্রদ্ধ সুকুমার রায় গান বেঁধেছিলেন--- 'এই তো ভালো লেগেছিল অ ালুর নাচন হাতায় হাতায়।' সেই সুকুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাঙাল সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন চাচন্দ্র বন্দ্যোপ াধ্যায়---- কেন না তাঁর মামার বাড়ি মালদহে---- এবং সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথকে বাঙাল ভাষায় বক্তৃতা দিতে বলা হলে তিনি বলেন, যদিও তাঁর মামাবাড়ি ওশ্বশুরবাড়ি বাঙাল দেশে, তবু তিনি 'মুগির
ডাল' ও 'কুলির অম্বল' ছাড়া অন্য কোন কিছু বলতে পারেন না।"

এ সম্পর্কে আরো বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক পরে ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় অ াশ্রমের আনন্দোৎসব সবচেয়ে জমে উঠেছিল হৈ হৈ সংঘের 'ভরসামঙ্গল'কে কেন্দ্র ক'রে। সে বছরে যথারীতি শ্রাবণের শেষ দিকে (৩০ শ্রাবণ ১৩৪২) বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে চারটি নতুন গানও লেখেন। সেই চারটি গান হল ১. আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণ-রাতি ২. মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম ৩. জানি জানি , তুমি এসেছ এ পথে ৪. কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি জান।

বর্ষামঙ্গলের কয়েকদিন পর। দামোদরের বন্যায় সব ভেসে গেছে। বর্ধমানের বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যদানের জন্য বর্ষামঙ্গ লের কয়েকদিন পরে আশ্রমের যুবক অধ্যাপক ও কর্মীরা 'ভরসা মঙ্গল' নাম দিয়ে এক 'আনন্দ-কোলাহলের' আয়োজন করেন। প্রবীণ উদ্যোক্তা ছিলেন তণ অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ভরসা-মঙ্গল উপলক্ষেই চারটি গান নতুন রচনা করে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হৈ হৈ সঙেঘর পক্ষে একটি প্রচারপত্র বিতরণ করা হল। বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এইরকম

---শান্তিনিকেতন হৈ-হৈ সঙঘ---
আসুন! আসুন!! আসুন!!!
বহু অনুরোধে শুধু একরাত্রির জন্য---
ভরসা-মঙ্গল
শনিবার--সিংহসদন, সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।
বিলম্বে হতাশ হইবেন।
---ওজনদরে গুদাম সাবাড়---
নাচ, গান, বাজনার মহোৎসব ।

প্রবেশ মূল্য--দুই আনা।
টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ
বন্যা-প্রপীড়িতদের
সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে।

নাট্যমঞ্চাধ্যক্ষ---- শ্রীনন্দদুলাল বন্দ্যো, অধিকারী--- শ্রীঊনপঞ্চাশ চন্দ,
কোষাধ্যক্ষ--- শ্রীনিভাপতি ঢোল।

প্রচারপত্রের শেষে যে তিনটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁদের নামগুলি আসলে ছদ্মনাম। আসল নাম গুলি হল শ্রীনন্দলাল বন্দ্যো নন্দলাল বসু, শ্রীঊনপঞ্চাশ চন্দ অনিলকুমার চন্দ, এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন নিভাপতি ঢোল অর্থাৎ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

অনুষ্ঠান হয়েছিল ৭ ভাদ্র ১৩৪২ সনে। চারপৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাও ছাপা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন প্রেসে ছাপা অনুষ্ঠান পত্রীর পৃষ্ঠায় নন্দলাল বসু- অঙ্কিত গাধার ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হৈ হৈ সঙেঘর সদস্যদের স্লোগান ছিল 'কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল'।

'যুবকের দল গোর গাড়িতে চড়িয়া গাইতে গাইতে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিল। সন্ধ্যার পর (৭ ভাদ্র ১৩৪২ ২৪ আগষ্ট ১৯৩৫) ভরসামঙ্গলে'র জলসায় রবীন্দ্রনাথ হইতে কবি-সেবক সচিচদানন্দ (আলু রায়) সকলেই ভেদাভেদ ভুলিয়া অংশগ্রহণ করেন। কবি দর্শকদের মধ্যে বসিয়া যুবকদের চপলতা আনন্দস্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতনের এই একটি দিক ছিল যেখানে মেলামেশা ছিল ভেদহীন।'

পুস্তিকার আরো একটি বিষয় ছিল উল্লেখযোগ্য--- যেখানে লেখা ছিল 'অনুগ্রহ পূবর্বক হাততালি দিবেন।' পুস্তিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শিরোনামে ছিল ইহারা এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন।" তার নীচে কেবল অংশগ্রহণকারীদের ছদ্মনাম মুদ্রিত। নামগুলির পাশাপাশি আসল পরিচিতিটি এইসঙ্গে যুক্ত করা হল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

"শ্রীযুক্ত শকটের শর্ম্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" গৌড়হরি বর্ম্মা গৌরগোপাল ঘোষ
" নিতাইচাঁদ ঢ্যাং নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
" সরোজগঞ্জিনী চ্যাং সরোজরঞ্জন চৌধুরী
" তারকব্রহ্ম গুঁই তারকচন্দ্র ধর
" ঝিন্তর ভুঁই ঝিনাথ মুখোপাধ্যায়
" নিভাপতি ঢোল সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
" ধী মোড়ল ধীরেন্দ্রমোহন সেন
" আদিভূত চট্টো ক্ষিতীশ রায়
" কালুরাম ভট্ট প্রমোদচন্দ্র গাঙ্গুলি
" কেষ্টকিশোর দাঁ পুণ্যময় সেন
" ম্যার্‌দম্‌ খাঁ ডা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হুতাশচন্দ্র কর সুধীরচন্দ্র কর
" সুচিচদানন্দ ভড় সচিচদানন্দ রায় (আলু)
" তেজবাহাদুর সিঙ্গী তেজেশচন্দ্র সেন
" সন্তদাস ফিরিঙ্গী সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী
" গিরিবাজ চত্রবর্ত্তী শৈলেশচন্দ্র চত্রবর্তী
আরো অনেক অনুবর্ত্তী। নাট্যমঞ্চাধ্যক্ষ---- নন্দদুলাল বন্দ্যো নন্দলাল বসু
অধিকারী---- ঊনপঞ্চাশ চন্দ অনিলকুমার চন্দ
কোষাধ্যক্ষ--- নিভাপতি ঢোল সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
নৃত্যাচার্য--- সরোজগঞ্জিনী চ্যাং সরোজরঞ্জন চৌধুরী
সঙ্গীতাচার্য্য---- হুতাশচন্দ্র কর"

তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেখা চারটি গানের মধ্যে তিনটি গান। প্রথমে "সঙেঘর জাতীয় সঙ্গীত" আমরা না-গাওয়ার দলরে...। পরে ২-সংখ্যক গান পায়ে পড়ি, শোনো ভাই গাইয়ে এবং সবশেষে

চতুর্থ পৃষ্ঠায় ও ভাই কানাই কারে জানাই.....। কেন জানি না ‘কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী....’ গানটি পত্রীতে মুদ্রিত হয় নি।
যে-তিনটি গানের মুদ্রিত প আছে পত্রীতে, পরবর্তীকালে তার পাঠভেদ পাওয়া যায়--- বিশেষ করে ‘আমরা না-গান গ াওয়ার দল’ গানটিতে। এখানে পত্রীতে মুদ্রিত গান ও পাঠভেদগুলি দেওয়া হল

।। পত্রী।।
আমরা না-গাওয়ার দল রে
না-গান-সাধার।
মোদের ভৈঁরোতে সূর্য্য
মুখ করে আঁধার।।
আমরা মল্লার ধরলেই ঘটে অনাবৃষ্টি,
এমনি অনাসৃষ্টি,---
ছাতির দোকানে লাগে শনির দৃষ্টি।
বসন্ত বাহারে তান দিলে আহা রে---
শূলের বেদনা ধরে মথুর দাদার।।
অমাবস্যার রাতে বেহাগ ধ’রে
কোকিলগুলোকে দিই নিঃঝুম ক’রে।
পূর্ণিমারাতে দক্ষিণের ছাতে
যেমনি কানাড়া ধরি অমনি ভয়ে মরি---
পাড়ার গোঁয়ারগুলোর কোমর-বাঁধার।।
।। গীতবিতান।। দ্বিতীয় সংস্করণ

না-গান গাওয়ার দল রে আমরা না-গলা সাধার।
মোদের ভৈঁরো রাগে, রবির রাগে মুখ আঁধার।।
আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ সমবায়ের চোটে
পাড়ার কুকুর সমন্বয়ে ভয়ে ফুকরে ওঠে,
আমরা কেবল ভয়ে মরি ধূর্জটি দাদার।।
মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি,
আধখানা সুর যেমন লাগাই বসন্ত বাহারে
তৎক্ষণাৎ আহা রে,
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদতাপ পালায় শ্রীরাধার।।
অমাবস্যা রাত্রে যেমন বেহাগ গাইতে বসা
কোকিলগুলোর লাগে দশম দশা।
শুক্ল কোজাগরী নিশায় জয় জয়ন্তী ধরি
অমনি মরি মরি
রাহুলাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদর।।

।। গীতবিতান।। প্রচলিত

আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে, আমরা না-গলা-সাধার
মোদের ভৈঁরোরাগে প্রভাতরবি রাগে মুখ-আঁধার।।
আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ-সমবায়ের চোটে
পাড়ার কুকুর সমস্বরে, ও ভাই, ভয়ে ফুক্‌রে ওঠে---
আমরা কেবল ভয়ে মরি ধূর্জটিদাদার ।।
মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি ।
আধখানা সুর যেমনি লাগাই বসন্তবাহারে
মলয়বায়ুর ধাত ফিরে যায়, তৎক্ষণাৎ আহা রে
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদতাপ পালায় শ্রীরাধার ।।
অমাবস্যার রাত্রে যেমনি বেহাগ গাইতে বসা
কোকিলগুলোর লাগে দশম-দশা ।
শুক্লকোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি,
অমনি মরি মরি
রাহু-লাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা-চাঁদার ।।

পরিচয়

হাসির গান অপ্রকাশিত পান্তর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা না গান গাওয়ার দল রে
না গান সাধার--
মোদের ভৈঁরোতে সূর্য মুখ করে আঁধার।
অমাবস্যার রাতে বেহাগ ধরে
কোকিলগুলোকে দেই নিঝুম করে
পূর্ণিমা রাতে---দক্ষিণের ছাতে
যেম্‌নি কানাড়া ধরি অমনি ভয়ে মরি
পাড়ার গোঁয়ারগুলোর কোমর বাধার।
আমরা মল্লার ধরিলে হয় অনাবৃষ্টি
ছাতির দোকানে লাগে শনির দৃষ্টি
বসন্তবাহারে টান দিলে আহা রে
শুলের বেদনা ধরে মথুরদাদার।

।। পত্রী ।।

পায়ে পড়ি, শোনো ভাই গাইয়ে,---
(আমাদের) পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে ।।

হেথায় সা-রে-গা-মা-গুলি
করে সদাই চুলোচুলি ,
কড়ি কোমল কোথায় গেছে তলাইয়ে ।।
হেথায় আছে তালকাটা বাজিয়ে
---বাধাবে সে কাজিয়ে।
হেথা চৌ-তালে ধামারে
কে কোথা ঘা মারে,---
তেরে কেটে মেরে কেটে , ধা-ধা-ধা ধাইয়ে ।।

।। গীতবিতান ।। দ্বিতীয় সংস্করণ

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে
হৈ হৈ পাড়াটা ছেড়ে দুর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সারে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ,
অভেদ রাগিণী রাগে ভগিনী ও ভাইয়ে ।।
তারছেঁড়া তম্বুরা তালকাটা বাজিয়ে
ঝাঁপতাল দাদরায় চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে
তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাইয়ে ।।

।। গীতবিতান ।। প্রচলিত

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে ।।
হেথা সা রে গা মা-গুলি সদাই করে চুলোচুলি,
কড়ি কোমল কোথা গেছে তলাইয়ে ।।
হেথা আছে তাল-কাটা বাজিয়ে
বাধাবে সে কাজিয়ে।
চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে---
তেরে-কেটে মেরে-কেটে ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে ।।

।। পত্রী ।।

ও ভাই কানাই কারে জানাই
দুঃসহ মোর দুঃখ,
তিনটে চারটে পাশ করেছি
নই নিতান্ত মুঃখ ।।

তুচ্ছ সা-রে-গা-মায় আমায় গলদ্‌ঘর্ম্ম ঘামায়, হায় রে---
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম।
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই
এই বড়ো মোর দুঃখ!
বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে--
হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্র্যামোফোনের ডিস্কে।
কণ্ঠখানার জোর আছে তাই,
লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই,
স্বয়ং প্রিয়া বলেন তোমার গলা বড়ই ক্ষ--
এই বড়ো মোর দুঃখ।

।। গীতবিতান ।। দ্বিতীয় সংস্করণ

ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ।
তিনটে চারটে পাশ করেছি নই নিতান্ত মুঃখ।।
তুচ্ছ সা-রে-গা-মায় আমার গলদ্‌ঘর্ম ঘামায়।
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম---
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে এই বড়ো মোর দুঃখ।।
বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে--
হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্কে।
কণ্ঠখানা জোর আছে তাই লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই,
স্বয়ং প্রিয়া বলেন তোমার গলা বড়ই ক্ষ
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে----।।

গীতবিতান ।। প্রচলিত।। পাঠভেদ

ছত্র ২ 'মুঃখ' স্থলে 'মুক্‌খ'
ছত্র ৩ '..... মায়' স্থলে '...মা'য়'
অনুষ্ঠান পত্রীতে অনুষ্ঠানের কোনো সূচী ছিল না। কিন্তু কিছুটা জানা যায় অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশগ্রহণকারী ক্ষিতীশ র ায়ের স্মৃতিতে। লিখে রাখেন শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী
".....নন্দলাল বসুর জামাই সন্তোষকুমার ভঞ্জচৌধুরী একটি 'অ্যাক্‌শন সং' গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অন্যের কথায় যেসব সুর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বই-এর 'গানের গুঁতো' কবিতাটি--- যার প্রথম লাইন হচ্ছে 'গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা।' ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরে এই গানটি গেয়েছিলেন সন্তোষকুমার ভঞ্জচৌধুরী। তাছাড়া প্রমোদকুমার গাঙ্গুলি সেজেছিলেন নবাবউল এবং তাঁর সাকরেদ ছিলেন 'গাবগুবাগুব' যন্ত্র হাতে তারকচন্দ্র ধর--- পরে শ্রীনিকেতনের বড়কর্তা। সেই ধরমশাই হাতের যন্ত্র বাজাতে বাজাতে গেয়েছিলেন--- 'শুধু গৌর নয়রে, এবার মাঠেঘাটে যাই গৌর হরি, পাড়াতে বেড়াই বসতি হলে করি গচুরি।'
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডঃ ডি এম সেন--- দু'জনে সখী সেজে হাতধরাধরি করে নাচলেন একটি গানের সঙ্গে। গানটি হল 'অ ায় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি, নাচিবি ঘিরিঘিরি গাহিবি গান।' গান শুনে আর নাচ দেখে রবীন্দ্রনাথ মহাখুশি। একেবারে উদ্ভাসিত মুখ। নিজের গুগম্ভীর ছেলে এবং কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব নাচছেন---- এ দৃশ্য সেদিন যাঁরা

দেখেছিলেন সেদিন তাঁরা সবাই হেসে লুটোপুটি হয়েছিলেন। সেদিন মেদ্রস (ম্যার্‌দম্‌) খাঁরাপী ডাক্তারবাবু শচীন মুখার্জিমশায়ও নেচেছিলেন। তিনি ভাল কীর্তন গান গাইতেন। তবে সেদিনের সেই নাচ ছিল সকলের কাছে অভাবিত। তাঁর সঙ্গে নেচেছিলেন আরও দুজন--- ডঃ পুণ্যময় সেন, শান্তিনিকেতনের বোটানির অধ্যাপক ও পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের নামকরা উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সরোঞ্জন চৌধুরী। সরোজ চৌধুরীমশাই চীনেম্যান সেজে বক্তৃতাও দেন বানানো চীনে ভাষায়। শ্রোতারা সবাই যখন হাসছেন, রবীন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এতটা আশা করেন নি। সেদিন সন্ধ্যায় সিংহসদনে অনুষ্ঠিত হৈ হৈ সঙেঘর আকর্ষক বিচিত্রানুষ্ঠান, তাঁর আঠারো বছর আগেকার বাঙালসভার মজাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শু হয়েছিল একটি পাঁচালি দিয়ে। মূল গায়েন ছিলেন ডাক্তারবাবু শচীন মুখোপাধ্যায় এবং দোহর ছিলেন ক্ষিতীশ রায় প্রমুখ অন্যান্যরা। পাঁচালির শু এইভাবে----

অগ্রে স্মরি ভানুসিংহ ঠাকুরের নাম,
পদকর্তা পদতলে রাখিল প্রণাম।
অতঃপর স্মরি মোরা বসু নন্দলালে,
তাঁরি আঁকা জয়টিকা সঙেঘর কপালে।''

----''হৈ হৈ সঙঘ'', 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ'

এখানে যে পাঁচালির উল্লেখ করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাই হৈ হৈ সংঘের অন্য একটি অনুষ্ঠান পত্রীতে। আর আশ্চর্যের বিষয়--- এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরে কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

'হৈ হৈ সঙেঘর নবতম অবদান' বলে ২৮ ভাদ্র বুধবার অভিনীত হয়েছিল পরশুরামের (রাজশেখর বসু) 'রাতারাতি'। কে কোন্‌ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আজ আর জানার কোনো উপায় নেই। সেই 'রাতারাতি' অনুষ্ঠানের চারপৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র এখানে মুদ্রিত হল

হৈ হৈ সঙঘ
রাতারাতি
বর্ষা অধিবেশন বুধবার, ২৮ শে ভাদ্র ।
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ --- নন্দলাল বসু অধিকারী-- অনিলকুমার চন্দ
প্রযোজক -- ক্ষিতীশ রায়
''কণ্ঠে যদি গান না আসে করবো কোলাহল''

হৈ হৈ সঙঘ রৈ রৈ ব্যাপার!!
পরশুরাম বিরচিত
''রাতারাতি''

হৈ হৈ সঙেঘর উদ্যোগে আগামী বুধবার সন্ধ্যায়
সিংহসদনে অভিনীত হইবে!
হৈ হৈ সঙেঘর
''নবতম অবদান''

প্রস্তাবনা
অগ্রে স্মরি ভানুসিংহ ঠাকুরের নাম
পদকর্ত্তা পদতলে সঁপিনু প্রণাম।
শ্রীরাজশেখর নাম পাকা রসায়নে
পরশুরামের পে কাব্যরস ভনে।।

তাঁহারি লিখিত পুঁথি নামে " রাতরাতি "
তাহা লয়ে আজি দেখো কী বা মাতামাতি।
অতঃপর স্মরি মোরা বসু নন্দলালে
তাঁরি জয়টিকা লিখা সঙেঘর কপালে ।।
অনিলকুমার জেনো যাত্রা-অধিকারী
রঙ্গরসে উপহাসে কী বা বলিহারী।
গোবিন্দ হইয়া এল-বৈষ্ণব গোঁসাই
ব্বিময় খ্যাত নাম বিনোদে নিতাই।।
চাটুজ্যে আকারে দেখি পুষ্ট সুধাকান্ত
কাঁঠালেতে ভিটামিন সে কথা কে জান্‌তো ।
বংশলোচনে হেরো লয়ে ইয়ার বক্সী
ন্তুব্দড়এর মালিক নাম শ্রীগোপাল Box-l ।
বিদ্যার ভবনে থাকে শশধর বাবু
কালিয়া খাইয়া বাছা হইলেন কাবু।
হোটেলেতে সমাসীন মিত্র --- ম্যানেজার
ফণা তুলে ভুজঙ্গের দেখ কী বাহার ।।
ঘননেপ্রফুল্ল হেরো তণের দলে
ভেদ নাই যেন আহা সুনীলে গোপালে ।
কবিতাটি অধ্যাপক ক্ষিতীশ রায়ের রচনা ।
(৪)
ডাক্তারের ভাগ্যে হায় বাঁট্‌লো ছিল নাম
ধায় দেখো শ্রীজীবন-জিগীষার ধাম ।।
সুধীর সুষেণ হ'ল গুম্ফে দিয়ে চাড়া
পৌষের পরিচয় নেই তাহা ছাড়া।
নগেন কিঙ্কর আর উদো সে নগেন
তাহাদের মধ্যে শোনো বাক্য লেন দেন ।।
শ্রীক্ষিতীশ বন্দে' দেখি নায়িকা আকার
নেড়ী নামে আবির্ভাব হইল তাহার।
নবীন কার্ত্তিক প আহা মরি মরি
হৃদয় হরণ করে চোর সাতকড়ি।।
চরণ তনয়ে দুষে উমাপতি রায়
অতঃপর অভিনেতা আর কেহ নাই।
পয়ার রচিল কবি, এ যে বড় রঙ্গ
সকলে ফুকারো জয় হৈহৈয় সঙঘ ।।

কিন্তু আশ্রমে যে একটি আনন্দের পরিমল সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সেখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্থকতা।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার
শ্রী স্বপন মজুমদার, অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রভবন, ব্বিভারতী

শ্রী অমিতাভ চৌধুরী এবং শ্রী সুবিমল লাহিড়ী

পরিকল্পনা, মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও প্রচ্ছদ
শ্রী সুবিমল লাহিড়ী

সহ-সম্পাদিকা
শ্রীমতী মৌমিতা সাহা / শ্রীমতী উপমা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com